দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ..06 JUL 1987 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম 3 ...

ঘরে-বাইরে

—সন্ধানী

প্রচলিত রীতি ভঙ্গ করে প্রথমেই অভিনন্দন জানাচ্ছি শাহনাজ বেগমকে। শাহনাজ ঢাকা বোর্ডের এস,এস,সি পরীক্ষায় মেয়েদের মধ্যে প্রথম এবং সম্মিলিত মেধা তালিকায় নবম স্থান দখল করেছে। লেটার পেয়েছে পাঁচটি। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখলকারীদের সমান।

প্রশ্ন উঠতে পারে—প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকারীদের বাদ দিয়ে শাহনাজকে অভিনন্দন জানাতে গেলাম কেন? উত্তর খুবই সোজা। চেষ্টার বিকল্প নেই, মতিঝিল গভর্ণমেন্ট হাইস্কুলের ছাত্রী শাহনাজ এ সত্য প্রমাণ করেছে। শাহনাজের বাবা মোটামুটি ভাল চাকুরে। রফতানী উন্নয়ন ব্যুরোর সহকারী পরিচালক। মা চিরায়ত বাংলার গৃহবধূ—যে গৃহবধূরা নিজেদের বর্তমান উৎসর্গ করে সন্তান তথা পরিবারের মঙ্গলের জন্য। বাংলাদেশে এমন অনেক নিম্নমান কেরানীও আছে, যাদের ঠাটবাট ধনাঢ্য ব্যক্তির মত, দামী আসবাবপত্র, ইলেকট্রোনিক যন্ত্রপাতি, বিদেশী সিগারেট এদের জন্য বিলাস দ্রব্য নয়। এদিক থেকে শাহনাজের বাবার দিনকাল তেমন মন্দ হওয়ার কথা ছিল না। কিন্তু তিনি কি সুখে আছেন, একটা দৃষ্টান্তই এর জন্য যথেষ্ট। ঢাকা শহরে আজকাল কবুতরের খোপের মত দু-কামরা বাসার ভাড়াও আড়াই হাজার টাকা। আট শ' থেকে হাজার টাকায় যে বাসা পাওয়া যায় এর চেহারা বস্তির পর্ণকুটিরের চেয়ে উন্নত নয়। শাহনাজের বাবা শাহজাহানপুরের একান্তে এক হাজার টাকার একটি টিনের বাড়ীতে বাস করেন। বিষয়বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা হয়তো এ তথ্য জেনে অবাক হবেন। কিন্তু কি করা! সংসারে অবাক হওয়ার মত বহু ঘটনাই ঘটে। তাইতো এ যুগে ধরা সমাজটা এখনো টিকে আছে। আর শাহনাজের বাবাও ছেলে-মেয়ে নিয়ে ওই টিনের ঘরে কোনমতে মাথা গুঁজে আছেন। এ অবস্থায় গৃহশিক্ষক নিয়োগ করার প্রশ্ন উঠে না। বাস্তবে তা হয়ওনি। শাহনাজ জানিয়েছে, তার কোন গৃহ শিক্ষক ছিল না। নিজের চেষ্টা থেকেই সে এ ফল করেছে।

সাবেক আমল হলে বক্তব্যটি হয়তো রেখাপাত করতো না। কিন্তু এখন গৃহশিক্ষক একটা রেওয়াজে পরিণত হয়েছে। সামর্থ্য থাক আর না থাক ছোট বেলা হতেই প্রাইভেট মাষ্টার রাখতে হয়। নতুবা ভাল ফলের আশা করা যায় না। এর অর্থ অবশ্য এ নয় যে, আজকালকার ছলে-মেয়েদের মেধা শক্তি নেই। অভাবে-অনটনে মেধার বিকাশ হয়তো ব্যাহত হতে পারে, তবু গাধা হয়ে যায়নি। এর পরও গৃহশিক্ষক রাখতে হয় বিশেষতঃ এ জন্য যে, স্কুলে নিয়মিত পড়া হয় না। প্রথমতঃ কারণে-অকারণে স্কুল বছরের প্রায় ছ'মাস বন্ধ থাকে। এর উপর শিক্ষকদের শিক্ষাদানে মন নেই। এক শ্রেণীর শিক্ষক শিক্ষকতাকে বাণিজ্যিক ব্যাপারে পরিণত করেছেন। স্কুলে নিয়মিত না পড়িয়ে তারা প্রাইভেট টিউশনির পরিবেশ সৃষ্টি করেন। হাজার দু' হাজার টাকার বিনিময়ে ছেলে-মেয়েদের বাসায় গিয়ে পড়ান। কেউ কেউ আবার প্রাইভেট ক্লিনিকের মত প্রাইভেট পাঠশালা খুলে বসেছেন। সকাল-সন্ধ্যা-রাতে দল ভিত্তিক ছাত্র-ছাত্রী পড়ান। প্রতি দলে দশ থেকে বার জন ছাত্র-ছাত্রী থাকে। প্রত্যেকের কাছ থেকে নেওয়া হয় দু-থেকে তিনশ' টাকা। এতে মাসিক উপরি রোজগার হয় চার-ছয় হাজার টাকা। শিক্ষকদের এ প্রথা চালু করারও হয়তো একটা যুক্তি আছে। তাঁরাও বলতে পারেন, বাঁচার জন্যই এ কাজ করতে হয়। না হলে মাসের বেতনে মাস চলে না। কথাটা উড়িয়ে দেবার মত নয়। দিন-কাল যা পড়েছে এতে ১০ হাজার টাকায়ও ৫ জনের সংসার চালানো কষ্ট। তবু শিক্ষকদের কাছ থেকে মানুষ আলাদা একটু কিছু আশা করে এ জন্য যে, শিক্ষকতা নিছক পেশা নয়। তাই আর কিছু না হোক, কোন ছাত্র কিংবা ছাত্রী যদি সম্ভাবনাপূর্ণ হয় তাহলে তার প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়া উচিত। শাহনাজের বাবা প্রাইভেট মাষ্টার রেখে দিতে পারেননি। কিন্তু স্কুলে মাষ্টার ছিল এবং মাষ্টার মহোদয়রা নিশ্চয় জানতেন, শাহনাজ প্রতিভাময়ী। একটু যত্ন পেলে হয়তো সে আরও ভাল ফল করতে পারত। সাবেক আমল হলে শিক্ষকরা নিজেরাই তার প্রতি বিশেষ যত্ন নিতেন।

শাহনাজ তার ভবিষ্যৎ জীবনের আশা তুলে ধরেছে। সে আশা পূর্ণ হবে কিনা জানি না। কারণ, এ দেশে প্রত্যহ শত-সহস্র আশার জন্ম-মৃত্যু ঘটছে। বনফুলের মত ফুটে বনফুলের মতই ঝরে পড়ছে বহু প্রতিভা। বেকারত্বের দানব ধ্বংস করে দিচ্ছে বহু সম্ভাবনাময় তরুণের জীবন। তবু শাহনাজের ক্ষেত্রে হয়তো এতোটা হতাশ হওয়ার কিছু নেই। শাহনাজ বিদেশে পড়ার সুযোগ পাবে না। কারণ তার বাবা ধনাঢ্য বা ঐ শ্রেণীর রাজনীতিক ও আমলা নন—যাঁরা ছেলে-মেয়েকে বিদেশে পাঠিয়ে পড়াতে সক্ষম। ঐ শ্রেণীর ব্যক্তিরা নিজের ছেলে-মেয়েদের বিদেশে পড়ান। দেশের শিক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে দাবার চাল চালেন। তবু শাহনাজের ব্যাপারে আমরা আশাবাদী। আপন চেষ্টায় সে বিশাল সাফল্য অর্জন করেছে। এ চেষ্টা যদি নিরবচ্ছিন্ন থাকে, আগামী দিনেও ব্যর্থ হবে না। শুধু তাই নয়, এটা অন্যদের জন্যও একটা আলোকবর্তিকা হিসাবে গণ্য হতে পারে। কারণ, শাহনাজের সাফল্য এ শিক্ষাই দেয় যে, চেষ্টার বিকল্প নেই। আন্তরিকভাবে চেষ্টা করলে বহু বন্ধুর পথ পাড়ি দেওয়া যায়, এবং এ যে শুধু শিক্ষার ক্ষেত্রে তা নয়— জীবনের অন্য ক্ষেত্রেও সত্য। বৃহৎ জীবনে অভাব-অনটন আজ নিত্যসঙ্গী। উন্নয়ন বাজেটের শতকরা ৮৫ ভাগ বিদেশী সাহায্য নির্ভর। কেউ কেউ হতাশার বাক্য উচ্চারণ করে বলেন, এদেশের সুদিন আসবে কি করে! আমরা মনে করি, এ হতাশাও নিরর্থক। আমাদের দুঃখ-দুর্গতির মূল সম্পদের অনটন নয়—আন্তরিকতা ও সৎ চেষ্টার অভাব। আন্তরিকতা এবং সৎ-চেষ্টা যদি থাকে তাহলে পরাজয়ই বৃহত্তর জয়ের ভিত্তি হতে পারে। কোন প্রতিকূলতাই অগ্রযাত্রাকে ব্যাহত করতে পারে না।

এদিক থেকে পরীক্ষায় এবার যারা পাস করতে পারেনি তাদেরও হতাশ হওয়ার বা হাল ছেড়ে দেওয়ার কিছু নেই। দুই দুইটি বিশ্বযুদ্ধে বিশ্বের বহু সমৃদ্ধ জনপদ ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু ধ্বংস শেষ কথা হতে পারেনি। ধ্বংসের বুকেই জেগে উঠেছে নতুন সভ্যতা। পূর্ব ও পশ্চিম জার্মানী এবং জাপান এর প্রমাণ। আলোচ্য ক্ষেত্রেও তাই। একটা পরীক্ষায় ফেল করাই জীবন শেষ হয়ে যাওয়া নয়। এতে এ-ও প্রমাণ হয় না যে, ফেল করা ছাত্র-ছাত্রীরা সবাই মেধাহীন। নানা কারণেই জীবনের একটা ক্ষেত্রে বিপর্যয় ঘটতে পারে। বিপর্যয় অভিশাপ হয় না—যদি বিপর্যয় উত্তরণের প্রয়াস থাকে। তাই এস-এস-সি পরীক্ষায় যারা পাস করতে পারেনি তাদের হতোদ্যম হওয়ার কিছু নেই। নতুন উদ্যমে বরং পরাজয়ের গ্লানি মুছে ফেলার জন্য সচেষ্ট হওয়া প্রয়োজন। কারণ, উদ্যম এবং সৎ-চেষ্টা শুধু ব্যক্তি জীবনে নয়, রাষ্ট্র জীবনেও উন্নতির চাবিকাঠি।